بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ জুন, ২০২২ মোতাবেক ১০ এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণে ইয়ামামার যুদ্ধের আলোচনা হচ্ছিল। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আব্বাদ বিন বিশ্‌রকে বলতে শুনেছি, হে আবু সাঈদ! আমাদের বাযাখার অভিযান সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরবর্তী রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, যেন আকাশ উন্মুক্ত করা হয়েছে আর এরপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, শাহাদত বরণ করা। আবু সাঈদ (রা.) বলেন, আমি তাকে বলি ইনশাআল্লাহ্ যা-ই হবে ভালো হবে। তিনি বলেন, ইয়ামামার দিন আমি তাকে দেখছিলাম, তিনি আনসারদের ডেকে বলছিলেন, 'আমার দিকে আস'। এই আহ্বানে তাদের চারশত লোক ফিরে এসেছিল। বারা' বিন মালেক, আবু দুজানা এবং আব্বাদ বিন বিশ্‌র তাদের সম্মুখে ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা সবাই বাগানের দরজার কাছে পৌঁছে যায়। আমি আব্বাদ বিন বিশ্‌রের শাহাদতের পর তাকে দেখেছি, তার চেহারায় তরবারির বহু আঘাতের চিহ্ন ছিল। আমি তাকে তার দেহের কোন একটি চিহ্ন দেখে সনাক্ত করতে পেরেছি।

এরপর হযরত উম্মে আম্মারার উল্লেখ পাওয়া যায়। উম্মে আম্মারা ইসলামের ইতিহাসে খুবই বীর একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তার নাম ছিল নুসায়বা বিনতে কা'ব। তিনি ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন এবং পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। মুসলমানরা যতক্ষণ বিজয়ীর আসনে ছিল ততক্ষণ তিনি মশকে পানি ভরে ভরে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন পরাজয়ের মুহূর্ত আসে তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে যান এবং বীরত্বের সাথে দাঁড়িয়ে যান। কাফেররা যখনই মহানবী (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হতো তখন তিনি তির ও তরবারি দিয়ে তাদের প্রতিহত করতেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) নিজে বলেছেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি তাকে আমার ডানে ও বামে সমানভাবে যুদ্ধ করতে দেখেছি। ইবনে কামিয়া যখন মহানবী (সা.)-এর নিকটে পৌঁছায় তখন উম্মে আম্মারা অগ্রসর হয়ে তাকে প্রতিহত করেন। এমনকি তার আক্রমণে হযরত উম্মে আম্মারার কাঁধে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তিনিও তরবারি চালান কিন্তু সে বর্মের ওপর বর্ম পরে রেখেছিল বলে তার তরবারির এই আঘাত কার্যকর হয় নি। যাহোক এই উম্মে আম্মারা (রা.)-এর একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করেছেন। হযরত উম্মে আম্মারা সেদিন নিজেও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর এযুদ্ধে তার এক বাহু কেটে গিয়েছিল। উক্ত যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের যে কারণ বর্ণিত হয়েছে তা হলো, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার ছেলে হাবীব বিন যায়েদ আমর বিন আসের সাথে ওমানে ছিল। আমর (রা.)-এর কাছে যখন মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি ওমান থেকে ফিরে আসেন আর পথিমধ্যে মুসায়লামার মুখোমুখি হন। হযরত আমর বিন আস (রা.) সফর করে এগিয়ে যান। হাবীব বিন যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন ওহাব পেছনে ছিলেন তাদের দুজনকে মুসায়লামা ধরে ফেলে এবং বলে, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল? আব্দুল্লাহ্ বিন ওহাব বলে, হ্যাঁ। মুসায়লামা তাকে লোহার শিকলে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেয়। সে তার কথা বিশ্বাস করে নি। সে ভেবেছে হয়তো প্রাণ রক্ষার জন্য এমনটি বলছে। যাহোক মুসায়লামা কায্যাব

যখন হাবীব বিন যায়েদ (রা.)কে বলে, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল? তিনি উত্তরে বলেন, আমি কানে শুনি না। সে পুনরায় বলে, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল? তিনি বলেন, হ্যাঁ। মুসায়লামা তাঁকে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়, ফলে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

যখনই সে তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রসূল? তিনি বলতেন, আমি শুনতে পাই না আর যখন সে একথা বলতো, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহর রসূল? উত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। এভাবে প্রতিবারই সে তাঁর একটি অঙ্গ কেঁটে ফেলতো। কাঁধ থেকে তাঁর হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং তাঁর পা হাঁটুর উপর পর্যন্ত কেটে ফেলা হয় আর এরপর তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এ সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হবার সময় তিনিও তাঁর কথা হতে পিছু হটেন নি আর মুসায়লামা কায্যাবও তার কথা হতে পিছপা হয় নি, এমনকি তিনি আগুনে পুড়ে শাহাদত বরণ করেন। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত হাবীব (রা.) যখন মুসায়লামার নিকট পত্র নিয়ে যান তখন সে হযরত হাবীব (রা.)কে এক একটি অঙ্গ কেঁটে শহীদ করে আর এরপর আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। হযরত উম্মে আম্মারা যখন তাঁর ছেলের মৃত্যুসংবাদ পান তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি স্বয়ং মুসায়লামার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, হয় তাকে হত্যা করবেন নয়তো নিজেই আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাবেন। ইয়ামামার যুদ্ধের জন্য হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছিলেন তখন উম্মে আম্মারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনার মত নারীর জন্য যুদ্ধে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন জিনিসই বাদ সাধতে পারে না। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। এই যুদ্ধে তাঁর আরেক ছেলে আব্দুল্লাহ্‌ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা ইয়ামামায় পৌঁছার পর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আনসাররা সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায় এবং মুসলমানরা সাহায্যের জন্য পৌঁছে যায়। আমরা বাগানের সামনে পৌঁছালে বাগানের দরজায় ভিড় লেগে যায়। আমাদের শত্রুরা বাগানের এক প্রান্তে অবস্থান করছিল এবং সেই প্রান্তে অবস্থান করছিল যেখানে মুসায়লামা ছিল। আমরা জোরপূর্বক সেখানে (বা বাগানে) প্রবেশ করি এবং তাদের সাথে আমরা কিছু সময় যুদ্ধ করি। আল্লাহ্‌র কসম! তাদের তুলনায় অন্য কাউকেই আমি আত্মরক্ষার এমন দৃঢ় ব্যবস্থা নিতে দেখি নি। কিন্তু আমি খোদার শত্রু মুসায়লামাকে আমি খুঁজে বের করার ও দেখার সংকল্প করি। আমি আল্লাহ্‌র সাথে এই অঙ্গীকার করেছিলাম যে, তাকে দেখতে পেলে আমি তাকে ছাড়বো না, হয় তাকে হত্যা করব নতুবা নিজেই শহীদ হয়ে যাব। লোকেরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের তরবারিগুলো একটি অন্যটির সাথে এরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যার কারণে কান বধির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় আর তাদের তরবারির আঘাতের শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না। অবশেষে আমি আল্লাহ্‌র শত্রুকে দেখতে পাই। আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। এক ব্যক্তি আমার সামনে আসে, সে আমার হাতে আঘাত করে এবং তা কেঁটে ফেলে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি সেই নোংরা ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছার সংকল্পে দোদুল্যমান হই নি। মুসায়লামা মাটিতে পড়ে ছিল আর আমি আমার ছেলে আব্দুল্লাহ্‌কে সেখানে দেখতে পাই। সে তাকে হত্যা করেছিল। একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উম্মে আম্মারা বর্ণনা করেন, আমার ছেলে তার কাপড় দিয়ে তার তরবারি পরিষ্কার করছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি মুসায়লামাকে হত্যা করেছ? সে বলে, হ্যাঁ, হে আমার মা! হযরত উম্মে আম্মারা বলেন, আমি আল্লাহ্‌র সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সিজদা করি। আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের মূলোৎপাটন করেছেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর আমি যখন আমার বাড়ি ফিরে আসি তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) একজন আরব চিকিৎসক নিয়ে আমার কাছে আসেন।

তিনি ফুটন্ত তেল দিয়ে আমার চিকিৎসা করেন। আল্লাহ্‌র কসম! এই চিকিৎসা আমার নিকট আমার হাত কাটা চেয়েও অধিক কষ্টকর ছিল। হযরত খালেদ (রা.) আমার অনেক খেয়াল রাখতেন এবং আমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। আমাদের অধিকারের কথা সর্বদা স্মরণ রাখতেন এবং আমাদের সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর তাকীদপূর্ণ নির্দেশাবলী স্মরণ রাখতেন। আব্বাদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করি, হে আমার দাদী! ইয়ামামার যুদ্ধে আহত মুসলমানের সংখ্যা (কি) অনেক বেশি ছিল? তিনি বলেন, হ্যাঁ! হে আমার বাছা। আল্লাহ্‌র শত্রু নিহত হয়েছে আর মুসলমানদের সবাই আহত ছিল। আমি আমার দুই ভাইকে এরূপ আহত অবস্থায় দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দনও অবশিষ্ট ছিল না। লোকেরা ১৫ দিন পর্যন্ত ইয়ামামাতে অবস্থান করেছিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আহত হবার কারণে আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে থেকে খুব স্বল্পসংখ্যক লোক হযরত খালেদ (রা.)-এর সাথে নামায পড়ত। তিনি বলেন, আমি জানি, বনু তাঈয়ের কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। আমি সেদিন আদী বিন হাতেমকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুনেছি, ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, আমার পিতামাতা তোমাদের জন্য উৎসর্গিত। এছাড়া আমার পুত্র যায়েদ সেদিন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উম্মে আম্মারা ইয়ামামার যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তরবারি ও বর্শার এগারোটি আঘাত তার গায়ে লেগেছিল। এছাড়া তার একটি হাতও কাটা পড়েছিল। হযরত আবু বকর তার খোঁজখবর নেয়ার জন্য আসতেন। কা'ব বিন উজরা সেদিন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। সেদিন মুসলমানদের কঠিন পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয় আর তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটতে হটতে সেনাবাহিনীর শেষ অংশকেও ছাড়িয়ে যায়। কা'ব চিৎকার করে বলেন, হে আনসার, হে আনসার! আল্লাহ্ ও রসূলের সাহায্যার্থে এগিয়ে আস! আর একথা বলতে বলতে তিনি মুহাক্কেম বিন তুফায়েল পর্যন্ত পৌঁছে যান। মুহাক্কেম তাকে আঘাত করে এবং তার বাহাত কেটে ফেলে। আল্লাহ্‌র শপথ! কা'ব তবুও দোদুল্যমান হন নি, বরং বাম হাত দিয়ে রক্ত ঝরা অবস্থাতেই ডান হাত দিয়ে পাল্টা আঘাত করতে থাকেন। অবশেষে তিনি বাগানে পৌঁছেন এবং তাতে প্রবেশ করেন। হাজেব বিন যায়েদ অওস গোত্রকে ডেকে বলেন, হে আশআ'ল! তখন সাবেত বলেন, 'তুমি হে আনসার বলে ডাক, তারা আমাদের এবং তোমাদের উভয়েরই বাহিনী। তখন তিনি ডাকতে থাকেন যে, হে আনসার, হে আনসার! এরই মাঝে বনু হানীফা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি দু'জন শত্রুকে হত্যা করে নিজেও শাহাদত বরণ করেন। এরপর তার স্থান গ্রহণ করেন উমায়ের বিন অরস। তার ওপরও শত্রুরা আক্রমণ করে বসে এবং তিনিও শহীদ হয়ে যান। অতঃপর আবু আকীল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু আকীল আনসারদের মিত্র ছিলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন তিনি সর্বপ্রথম যুদ্ধ করতে বের হন। তার গায়ে একটি তির বিদ্ধ হয় যা কাঁধ ফুঁড়ে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি সেই তির নিজহাতে টেনে বের করেন। এই আঘাতের ফলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি মাআ'ন বিন আদীকে বলতে শোনেন, হে আনসার! শত্রুদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ফিরে আস। আমর বর্ণনা করেন যে, আবু আকীল তখন নিজ দলের সাথে যোগ দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস করি, আবু আকীল! আপনি কী করতে চাচ্ছেন? আপনার এখন যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই, আপনি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি উত্তরে বলেন, যিনি ডাকছেন তিনি আমার নাম ধরে ডেকেছেন। আমি বললাম, তিনি তো শুধু আনসার নাম ধরে ডেকেছেন, তিনি আহতদের উদ্দেশ্য করে তা বলেন নি। আবু আকীল উত্তর দেন, আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যরা দুর্বলতা দেখালেও আমি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেব। ইবনে উমর বলেন, আবু আকীল সাহস করে উঠে দাঁড়ান, ডানহাতে খোলা তরবারি নেন এবং উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, হে আনসার! হুনায়নের দিনের মতো পাল্টা আক্রমণ কর। তারা সবাই জড়ো হন এবং শত্রুদের

সামনে মুসলমানদের ঢালের মতো হয়ে যান, এমনকি তারা শত্রুদেরকে বাগানে পালাতে বাধ্য করেন। তারা পরস্পর যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয় [অর্থাৎ ভেতরে গিয়ে তুমুল যুদ্ধ হয়] এবং তরবারির সাথে তরবারির সংঘর্ষ হতে থাকে। আমি আবু আকীলকে দেখেছি, তার আহত হাত কাঁধ থেকে কাটা পড়েছিল এবং তার সেই হাতটি মাটিতে গিয়ে পড়ে। তার দেহে চৌদ্দটি আঘাত লাগে। সেই আঘাতগুলোর ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইবনে উমর বলেন, আমি যখন আবু আকীলের কাছে পৌঁছি তখন তিনি ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। আমি ডাকলাম, হে আবু আকীল! তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলেন, লাব্বায়েক। এরপর জিজ্ঞেস করেন, কারা পরাজিত হয়েছে? আমি উচ্চকণ্ঠে বলি, সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আল্লাহ্‌র শত্রু মুসায়লামা মারা পড়েছে। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলতে বলতে নিজের আঙুল আকাশের দিকে ওঠান এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে উমর বলেন, আমি আমার পিতা হযরত উমরকে তার পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করি, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন, তিনি সবসময় শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা রাখতেন; আর আমার জানামতে তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর বাছাইকৃত কয়েকজন সাহাবীর মাঝে অন্যতম ছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন ।

মুজাআ বিন মুরারা বনু হানীফার নেতা ছিল, তার কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে; সে একদিন মাআ'ন বিন আদীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলে, তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে আমার কাছে সেই বন্ধুত্বের কারণে আসতেন, যা আমার ও তার মাঝে অনেক আগে থেকেই ছিল। মুজাআ বলেন, তিনি যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রতিনিধি দলের সাথে আসেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) একদিন তাঁর সাথীদের নিয়ে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, আমিও তাদের সাথে বের হই। হযরত আবু বকর (রা.) ও তাঁর সাথীরা সত্তর জন সাহাবীর কবরে যান। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা! আমি ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের চেয়ে বেশি অন্য কাউকে তরবারির আক্রমণের সামনে অবিচল থাকতে দেখি নি আর তাদের চেয়ে কঠিন আক্রমণকারীও দেখি নি। তাদের মাঝে আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন, তার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তা বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলেন, (কে) মাআ'ন বিন আদী? আমি নিবেদন করি, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) আমার ও তার বন্ধুত্ব সম্পর্কে জানতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন। তুমি একজন সালেহ্ ব্যক্তির উল্লেখ করেছ। আমি বলি, হে রসূল (সা.)-এর খলীফা! আমি যেন এখনও আমার কল্পনার চোখে তাকে দেখতে পাচ্ছি। আর আমি খালেদ বিন ওয়ালীদের তাঁবুতে বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। মুসলমানদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায় আর এতো মারাত্মকভাবে তাদের পদস্খলন হয় যে, আমি ভেবেছিলাম এখন আর (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাদের অবস্থা দৃঢ় হওয়া সম্ভব নয়, আর এটি আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, খোদার কসম! সত্যিই কি এটি তোমার কাছে অসহনীয় ছিল? কেননা সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল আর এজন্যই বন্দি হয়েছিল। যাহোক, সে বলে, আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম! আমার জন্য তা অসহনীয় ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এ কারণে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। মুজাআ বলেন, আমি মাআ'ন বিন আদীকে দেখি যে, তিনি মাথায় লাল কাপড় বেঁধে পাল্টা আক্রমণ করছিলেন। তরবারি কাঁধের ওপর রাখা ছিল আর সেটি থেকে রক্তবিন্দু ঝরছিল। তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেন, হে আনসারগণ! পূর্ণ শক্তি দিয়ে আক্রমণ কর। মুজাআ বলেন, আনসাররা ফিরে গিয়ে আবার আক্রমণ করেন, আর আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, তারা শত্রুদের ভিত টলিয়ে দেন। আমি খালেদ বিন ওয়ালীদের সাথে ঘুরছিলাম (কেননা) আমি বনু হানীফার মৃত ব্যক্তিদেরকে চিনতাম আমি আনসারদেরও দেখছিলাম যে, তারা শহীদ

হয়ে পড়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, এমনকি তার পবিত্র শ্মশ্রু অশ্রুজলে ভিজে যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যোহরের সময় হলে আমি বাগানে প্রবেশ করি, তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) মুয়াজ্জিনকে আদেশ দিলে সে বাগানের দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে যোহরের আযান দেয়। লোকজন যুদ্ধের কারণে বিচলিত ছিল। অবশেষে আসরের পর যুদ্ধ শেষ হলে হযরত খালেদ (রা.) আমাদেরকে যোহর ও আসরের নামায পড়ান। অতঃপর যারা পানি পান করাচ্ছিল তাদেরকে শহীদদের দিকে প্রেরণ করেন। আমিও তাদের সাথে ঘুরতে থাকি, আমি আবু আকীলের পাশ দিয়ে যাই। তিনি ১৫টি আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি আমার কাছে পানি চাইলে আমি তাকে পানি পান করাই আর তার সবগুলো ক্ষত স্থান হতে পানি বের হতে থাকে এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। এরপর আমি বিশর বিন আব্দুল্লাহ্‌র পাশ দিয়ে যাই। তিনি স্বস্থানে বসেছিলেন, তিনি আমার কাছে পানি চাইলে আমি তাকে পানি পান করাই আর তিনিও শহীদ হয়ে যান।

মাহমুদ বিন লাবীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালেদ (রা.) যখন ইয়ামামাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তখন মুসলমানরাও এই যুদ্ধে বড় সংখ্যায় শহীদ হন, এমনকি মহানবী (সা.)-এর অধিকাংশ সাহাবী শহীদ হয়ে যান আর মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা জীবিত ছিলেন তাদের মাঝে অনেকেই মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন। হযরত খালেদ (রা.)-কে যখন মুসায়লামার নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি মুজাআকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সাথে নিয়ে আসেন যেন মুসায়লামাকে শনাক্ত করা যায়। সে লাশগুলোর মাঝে তার খোঁজ করতে থাকে, কিন্তু সেখানে মুসায়লামাকে পাওয়া যায় নি। অতঃপর সে বাগানে প্রবেশ করলে খাট, পীত বর্ণের, চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট এক ব্যক্তির লাশ দৃষ্টিগোচর হলে মুজাআ বলে, এ হচ্ছে মুসায়লামা, যার কাছ থেকে তোমরা মুক্তি লাভ করেছ। উত্তরে হযরত খালেদ (রা.) বলেন, এ হচ্ছে সেই লোক, যে তোমাদের সাথে এই সবকিছু করেছে। মুজাআ যেহেতু বন্দি ছিল, আর বনু হানীফার প্রতিনিধি ছিল (এবং) নেতা ছিল, তাই তাদেরকে রক্ষা করতেও চাচ্ছিল। অধিকাংশ যুবক তো নিহত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে একটি কৌশল আঁটে। দুর্গে যারা আবদ্ধ ছিল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সে প্রতারণা করে এবং হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর সাথে একটি শান্তিচুক্তি করে। সে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে বলে, এরা যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল তারা তো ত্বরাপরায়ণ লোক ছিল। কিন্তু দুর্গ এখনও যুদ্ধবাজদের দ্বারা পরিপূর্ণ। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তুমি ধ্বংস হও, বলছো কী! তখন মুজাআ বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যা বলছি তা নিরেট সত্য বলছি। তাই আসো এবং আমার পশ্চাতে অপেক্ষমান আমার জাতির বিষয়ে আমার সাথে সন্ধি করে নাও। (প্রতারণামূলকভাবে সে এসব কথা বলে, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকৃত বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে)। হযরত খালেদ (রা.) সেই ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলমানদের যে পরিমাণ প্রাণহানীর দৃশ্য দেখেছিলেন সে নিরিখে ভাবলেন যে, এখন যেহেতু বনু হানীফার সর্দার এবং মূল বিদ্রোহী নাটেরগুরু নিজ সাঙ্গপাঙ্গসহ মারা গেছে তাই এখন মুসলমানদের আর কোনো প্রাণহানী এড়ানোই উত্তম হবে। অতএব হযরত খালেদ (রা.) সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হলেন। হযরত খালেদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে মীমাংসার নিশ্চয়তা আদায়ের পর মুজাআ বলে, আমি তাদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করে আসি। এরপর সে তাদের কাছে যায় অথচ মুজাআ ভালভাবেই জানতো যে, দুর্গে মহিলা, শিশু এবং চরম বার্ধক্যে উপনীত বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে তাদেরকে বর্ম পরায় আর মহিলাদের পরামর্শ দিয়ে বলে, 'আমি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তোমরা দুর্গের প্রাচীরের ওপর আরোহণ করে সেখানে অবস্থান করবে। এরপর সে খালেদ (রা.)-এর কাছে আসে আর বলে, আমি যে শর্তে সন্ধি করেছিলাম তারা তা মানতে সম্মত

নয়। হযরত খালেদ (রা.) যখন দুর্গের দিকে তাকালেন তখন দেখলেন, দুর্গ লোকে লোকারণ্য। (মহিলা এবং অন্যান্যদেরকে বর্ম পরিধান করিয়ে বসিয়ে এসেছিল)। এই যুদ্ধে মুসলমানদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয় আর যুদ্ধ অতি দীর্ঘ হয়ে যায় তাই মুসলমানরা অর্জিত বিজয় নিয়ে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী ছিল কেননা তাদের জানা ছিল না যে, ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে। তাই খালেদ (রা.) তুলনামূলক নরম শর্তে তথা স্বর্ণ, রৌপ্য, অস্ত্রসস্ত্র এবং অর্ধেক বন্দি প্রাপ্ত হওয়ার শর্তে সন্ধি করে নেন। এমনও কথিত আছে যে, এক চতুর্থাংশ প্রাপ্তির শর্তে সন্ধি করেছিলেন। দুর্গের ফটক যখন খোলা হয় তখন সেখানে মহিলা, শিশু আর দুর্বল ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তখন হযরত খালেদ (রা.) মুজাআকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি আমাকে ধোকা দিয়েছ। মুজাআ বলে, এরা আমার জাতির লোক আর এদেরকে রক্ষা করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। আমার আর কী-ইবা করার ছিল? এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর পত্র হযরত খালেদ (রা.)-এর হস্তগত হয় (যাতে লেখা ছিল) প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তিকে যেন হত্যা করা হয়। কিন্তু উক্ত পত্র ঠিক তখন পৌঁছায় যখন হযরত খালিদ (রা.) তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে ফেলেছিলেন। তাই তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং চুক্তিভঙ্গ করেন নি কেননা তাদেরকে তাদের প্রাণের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। অতএব হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মুসলমানদের অবস্থা এবং সন্ধির প্রকৃত কারণ বলার উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যেটি পড়ে হযরত আবু বকর (রা.) তুষ্ট ও আনন্দিত হন। হযরত খালিদ (রা.) সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর উক্ত দুর্গের বিষয়ে নির্দেশ জারি করেন। তদনুযায়ী সেখানে লোক নিযুক্ত করা হয়। মুজাআ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে, যে যে বিষয়ে সন্ধিচুক্তি হয়েছে তার মধ্য থেকে কোনো জিনিস আপনার দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না। আর যে-ই কোন গোপন বিষয়ের জ্ঞান রাখবে যা লুকানো আছে, উক্ত খবর খালিদ (রা.)-এর কর্ণগোচর করা হবে। এরপর দুর্গ খুলে দেয়া হয়। অঢেল অস্ত্রসস্ত্র হস্তগত হয় এবং সেগুলো হযরত খালিদ (রা.) একত্রিত করেন আর সেই দুর্গ থেকে যে দিনার ও দিরহাম লাভ হয়- সেগুলোও পৃথকভাবে একত্রিত করা হয় আর বর্মগুলোও একত্রিত করা হয় এবং বন্দীদেরকে দুর্গের বাইরে বের করে তাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এরপর গণিমতের মালের বিষয়ে লটারী করা হয়। বর্ম এবং বেড়ি আর স্বর্ণ ও রৌপ্য পরিমাপ করা হয় এবং সেখান থেকে খুম্‌স (তথা খলীফার জন্য নির্ধারিত একপঞ্চমাংশ) পৃথক করা হয়। খুম্‌স-এর চারভাগ (প্রাপক) সকলের মাঝে বন্টন করা হয়। ঘোড় সোয়ারীদের জন্য দুই অংশ নির্ধারণ করা হয় আর ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ নির্ধারণ করা হয়। আর সেগুলোর মাঝ থেকে 'খুম্‌স' পৃথক করা হয় এবং সমস্ত 'খুম্‌স' হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর বনু হানীফা বয়আত করার লক্ষ্যে এবং মুসায়লামার নবুয়্যতের সাথে কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করার জন্য একত্রিত হয়। সকলকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর কাছে আনা হয়। সেখানে তারা বয়আত করে এবং পুনরায় নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাদের একটি প্রতিনিধিদল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে মদিনাতে প্রেরণ করেন। তারা যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে পৌঁছে তখন তিনি (রা.) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, তোমরা কীভাবে মুসায়লামার ফাঁদে পা দিলে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে? তারা জবাবে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! আমাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আপনি ভালভাবে অবগত। মুসায়লামা নিজেরও উপকার করে নি এবং তার আত্মীয়-স্বজন ও জাতির লোকেরাও তার থেকে উপকৃত হতে পারে নি।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ আছে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে (সৈন্যসামান্তসহ) ইয়ামামা প্রেরণ করেন

তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর কাছে হাজ্‌র জনবসতির কিছু খেজুর আনা হয়। তিনি সেগুলো থেকে একটি খেজুর খেলেন। কিন্তু দেখলেন সেটি খেজুর নয় বরং খেজুর সদৃশ খেজুরের বিচি যা বেশ শক্ত। তিনি কিছুক্ষন সেটিকে চিবালেন এরপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বলেন, খালিদকে ইয়ামামাবাসীর পক্ষ থেকে কঠিন মোকাবেলার সম্মুখীন হতে হবে; আল্লাহ তা'লা অবশ্যই তার হাতে বিজয় দান করবেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইয়ামামা থেকে আগত সংবাদের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। আর যখনই খালিদের পক্ষ থেকে কোন দূত আসত, তিনি (রা.) তার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। একদিন হযরত আবু বকর (রা.) দুপুরের দাবদাহে বের হন। তিনি 'সারার' নামক স্থানে যেতে চাচ্ছিলেন যেটি মদিনা থেকে তিন মাইল দুরত্বে অবস্থিত ছিল। তাঁর সাথে হযরত উমর (রা.), হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.), হযরত তোলায়হা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.) এবং মুহাজের ও আনসারদের একটি দল ছিল। পথিমধ্যে আবু খায়সামা নাজ্জারীর সাথে তার (রা.) সাক্ষাৎ হয়, যাকে খালিদ (রা.) প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু খায়সামা! খবর কী? তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! খবর খুব ভাল। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে ইয়ামামার বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) (কৃতজ্ঞতার) সিজদা করেন। আবু খায়সামা বলেন, আপনার নামে খালিদ (রা.)-এর পত্র আছে। হযরত আবু বকর (রা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহ তা'লার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, যুদ্ধের বিষয়ে আমাকে বল যে, কেমন যুদ্ধ হয়েছিল? আবু খায়সামা হযরত খালিদ (রা.)-এর বিস্তারিত কার্যক্রম সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন যে, কীভাবে তিনি তার সঙ্গীদেরকে সারিবদ্ধ করেছিলেন, কীভাবে মুসলমানরা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তাদের মধ্যে কারা শহীদ হন। হযরত আবু বকর (রা.) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন পড়েন এবং তাদের অনুকূলে খোদার রহমতের দোয়া করেন। আবু খায়সামা আরও বলেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আমরা বেদুঈন। তারা আমাদেরকে পরাজিত করে এবং আমাদের সাথে তা করে যা আমরা ভাল মনে করতাম না। এরপর আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি যা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটিকে আমি ভীষণ অপছন্দ করতাম। আর আমার মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, খালিদকে নিশ্চয়ই ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। খালিদ যদি তাদের সাথে সন্ধি না করতো এবং তাদেরকে তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন করতো তাহলে ভাল হতো। এসব শহীদদের পর ইয়ামামাবাসীদের মধ্য থেকে কারো বেঁচে থাকার কী অধিকার আছে? তিনি (রা.) বলেন, মুসায়লামা কায্‌যাবের সঙ্গীসাথীরা তার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত পরীক্ষায় নিপতিত থাকবে, তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ যদি তাদেরকে রক্ষা করেন সেকথা ভিন্ন। এরপর ইয়ামামার প্রতিনিধিদল হযরত খালিদের সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়।

নিহতদের সংখ্যা সম্পর্কে কথিত আছে, এ যুদ্ধে নিহত মুরতাদদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। অপর এক রেওয়ায়েতে একুশ হাজারও বর্ণিত হয়েছে।

অপরদিকে প্রায় পাঁচশ' কিংবা ছয়শ' মুসলমান শহীদ হন। কোন কোন রেওয়ায়েতে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ মুসলমানদের সংখ্যা সাতশ', বারশ' এবং সতেরশ' পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই যুদ্ধে সাতশ'র অধিক কুরআনের হাফিয শহীদ হয়েছিলেন। এই শহীদদের মাঝে জ্যেষ্ঠ সাহাবা এবং কুরআনের হাফিযগণও ছিলেন যাদের সম্মান ও পদমর্যাদা মুসলমানদের দৃষ্টিতে অনেক উঁচু ছিল। তাদের শাহাদত অনেক বড় এক মর্মন্তুদ ঘটনা ছিল, কিন্তু এই কুরআনের হাফিযদের শাহাদতই পরবর্তীতে কুরআন সংকলনের কারণ হয়। এই শহীদদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত সাহাবীর নাম হল, হযরত যায়েদ বিন

খাত্তাব (রা.), হযরত আবু হুযায়ফা বিন রবীয়্যা (রা.), আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্ত কৃতদাস হযরত সালেম, হযরত খালিদ বিন উসায়েদ (রা.), হযরত হাকাম বিন সাঈদ (রা.), হযরত তুফায়েল বিন আমর দওসী (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)'র ভাই হযরত সায়েব বিন আওয়াম (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হারেস বিন কায়েস (রা.), হযরত আব্বাদ বিন হারেস (রা.), হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.), হযরত মালিক বিন অওস (রা.), হযরত সুরাকা বিন কা'ব (রা.), মহানবী (সা.)-এর খতীব হযরত মা'আন বিন আদী (রা.), হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শিমাস (রা.), হযরত আবু দুজানা (রা.), মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল-এর নিষ্ঠাবান মু'মিন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত ইয়াযীদ বিন সাবেত খাযরাজী (রা.)।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইয়ামামার যুদ্ধ দ্বাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল পক্ষান্তরে অনেকের মতে এটি এগারো হিজরীর শেষদিকে হয়। এই উভয় উক্তির মাঝে মিল বা সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, (হয়তো) এগারো হিজরীতেই যুদ্ধের সূচনা হয়ে থাকবে এবং বারো হিজরীতে গিয়ে (তা) শেষ হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

যারা (মিথ্যা নবুয়্যতের) দাবি করেছিল এবং যাদের সাথে সাহাবীরা যুদ্ধ করেন– তারা সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিপক্ষে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। মুসায়লামা তো স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর যুগে তাঁকে (সা.) লিখেছিল, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আরবের অর্ধেক জমিন আমাদের এবং অর্ধেক কুরাইশদের জন্য। আর মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সে **হাজর** ও **ইয়ামামা** থেকে তাঁর নিযুক্ত গভর্নর সুমামা বিন উসাল-কে বহিষ্কার করে এবং নিজেই সেখানকার গভর্নর সেজে বসে আর মুসলমানদের ওপর সে আক্রমন করে। অনুরূপভাবে **মদীনার দু'জন সাহাবী হাবীব বিন যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহ্হাব'**কে সে আটক করে এবং বাহুবলে তাদেরকে নিজের নবুওয়্যত স্বীকার করানোর অপচেষ্টা করে। আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহ্হাব ভীত হয়ে তার কথা মেনে নেন কিন্তু হাবীব বিন যায়েদ তার কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এ কারণে মুসায়লামা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একে একে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।

একইভাবে ইয়েমেনেও মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত কতক কর্মকর্তাকে সে বন্দী করে আর কতককে কঠোর শাস্তি দেয়। অনুরূপভাবে তাবারী লিখেছেন যে, **আসওয়াদ আনসী**ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যেসব কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিল তাদেরকে সে কষ্ট দিয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে যাকাত ছিনিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর সে **সানআ'**তে মহানবী (সা.)-এর নিযুক্ত শাসক **শাহ্র বিন বাযান**-এর ওপর আক্রমণ করেছিল। অনেক মুসলমানকে (সে) শহীদ করে, লুটতরাজ করে, গভর্নরকে হত্যা করে এবং তাকে হত্যা করার পর তার মুসলমান স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিয়ে করে। **বনূ নাজরান**ও বিদ্রোহ করেছিল এবং তারাও **আসওয়াদ আনসী'**র দলে যোগ দেয় আর তারা দু'জন সাহাবী **আমর বিন হাযম** এবং **খালিদ বিন সাঈদ'**কে (তাদের) এলাকা থেকে বহিষ্কার করে।

এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিকারকদের সাথে এজন্য যুদ্ধ করা হয় নি যে, তারা মহানবী (সা.)-এর উম্মতে নবী হওয়ার দাবি করেছিল; আর মহানবী (সা.)-এর ধর্ম প্রচারের দাবি করেছিল বরং তাদের সাথে সাহাবীদের যুদ্ধ করার কারণ হল, তারা ইসলামী শরীয়তকে রহিত করে নিজেদের মনগড়া আইন প্রবর্তন করে এবং নিজ নিজ অঞ্চলের (স্বঘোষিত) শাসক হবার দাবি করে। শুধু আঞ্চলিক শাসক হবার দাবিদারই ছিল না বরং তারা সাহাবীদেরকে হত্যা(ও) করেছে। মুসলিম শাসিত অঞ্চলে সেনাভিযান চালিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আরবের বেদুঈনরা মুরতাদ হয়ে যায়। এহেন সংকটাপন্ন সময়ের চিত্র হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে তুলে ধরেন যে, আল্লাহ্‌র নবী (সা.) সবে পরলোক গমণ করেছেন আর অমনি কোন কোন মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিকারকের অভ্যুদয় ঘটে আর কিছু লোক নামায পরিত্যাগ করে এবং (তাদের) আচরণ পাল্টে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে ও এমন বিপদসঙ্কুল অবস্থায় আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর খলীফা এবং স্থলাভিষিক্ত (নিযুক্ত) হন। আমার পিতার ওপর এমন সব দুঃখ-যাতনা এসেছে যে, তা যদি পর্বতের ওপর আপতিত হতো তবে তাও মাটিতে মিশে যেত। এখন গভীরভাবে প্রণিধান কর, বিপদাবলীর পর্বত ভেঙ্গে পড়া সত্ত্বেও সাহস ও মনোবল না হারানো; এটি কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এই অবিচলতা সিদ্‌ক বা নিষ্ঠার দাবি রাখতো আর **"সিদ্দীক"**-ই তা দেখিয়েছেন। এই সংকট মোকবিলা করা অন্য কারও জন্য অসম্ভব ছিল। সকল সাহাবী তখন উপস্থিত ছিলেন। কেউ একথা বলে নি যে, এটি আমার প্রাপ্য। তারা দেখছিল যে, আগুন লেগে গেছে। এই আগুনে কে ঝাঁপ দেবে? এমন সময় হযরত উমর (রা.) হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতে বয়আত করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সবাই বয়আত করেন। তাঁর (রা.) এই সিদ্‌ক বা নিষ্ঠাই এই নৈরাজ্যকে দমন করে আর সেসব অনিষ্টকারীকে ধ্বংস করে। মুসায়লামা'র সাথে এক লক্ষ মানুষ ছিল আর তার বিষয়টি ছিল **'এবাহাত'** (অর্থাৎ শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়সমূহকে বৈধতা প্রদান) সংক্রান্ত সমস্যা। **'এবাহাত'** হল, শরীয়তে কোন বিষয়কে বৈধতা প্রদান বা হালাল আখ্যা দেয়া। জনগণ তার মনগড়া কথাবার্তা দেখে তার দলভুক্ত হতে থাকে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সে অনেক অন্যায্য বিষয়কে বৈধ আখ্যা দেয়। মোটকথা, **'এবাহাত'** (অর্থাৎ শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়সমূহকে বৈধতা প্রদান) সংক্রান্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করে জনগণ তার ধর্মের অনুসারী হতে থাকে কিন্তু খোদা তা'লা তার সাথে থাকার প্রমাণ দিয়েছেন এবং সকল সংকটকে সহজ করে দেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "গবেষকদের কাছে এটি অবিদিত নয় যে, তাঁর খিলাফতকাল আশঙ্কা ও বিপদসংকুল যুগ ছিল। যেমন- মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বিপদাবলী নেমে আসে। অগণিত মুনাফিক মুরতাদ হয়ে যায় আর মুরতাদরা ধৃষ্ট হয়ে ওঠে। মিথ্যাবাদীদের এক শ্রেণি নবুয়্যতের দাবি করে বসে আর অগণিত মরুবাসী বেদুঈন তাদের দলে যোগ দেয়। এক পর্যায়ে মুসায়লামা কায্‌যাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ অজ্ঞ ও দুরাচারী লোক যোগ দেয়। নৈরাজ্য ফুঁসে ওঠে, সমস্যা ঘনিভূত হয়, দূর-নিকটের সবকিছুই সমস্যা কবলিত হয়ে যায় আর মু'মিনরা প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হন। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাওয়ার মত ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মু'মিনরা এতটাই ছটফট করছিলেন যেন তাদের হৃদয়ে কয়লার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল অথবা তাদেরকে ছুরি দিয়ে জবাই করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে তারা শ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর বিয়োগান্তক বেদনায় কাঁদছিলেন অপরদিকে সেসব অরাজকতার কারণে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন যা ভস্মকারী অগ্নির ন্যায় আবির্ভূত হয়েছিল। কোথাও শান্তির কোন নামগন্ধও ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা আবর্জনার স্তুপে গজিয়ে ওঠা সবুজ ঘাসের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। মু'মিনদের ভয় এবং তাদের ভীতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল আর তাদের হৃদয় আতঙ্ক ও অস্থিরতায় জর্জরিত ছিল। এমন স্পর্শকাতর সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) যুগের শাসক ও হযরত খাতামুন্নবীঈন (রা.)-এর খলীফা মনোনীত হন। মুনাফেক, কাফের ও মুরতাদদের যেসব আচার আচরণ এবং রীতিনীতি তিনি (রা.) প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তিনি (রা.) দুঃখ শোকে মুহ্যমান ছিলেন। তিনি (রা.) শ্রাবণবারির ন্যায় অঝোরে কাঁদতেন এবং তাঁর অশ্রু বহমান ঝর্ণার মত বইতে থাকে আর তিনি (রা.) তার আল্লাহ্‌র দরবারে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে যখন খলীফা মনোনীত করা হয় এবং আল্লাহ্ তাঁর হাতে আমীরের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তখন খিলাফতের সূচনাতেই তিনি সব দিক থেকে নৈরাজ্যের উত্তাল ঢেউ, মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিদারদের দুর্বার ষড়যন্ত্র এবং মুনাফেক ও মুরতাদদের বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর ওপর এত বেশি বিপদাপদ নেমে আসে যে, তা যদি কোন পাহাড়ের ওপরও পড়ত তাহলে তা-ও মাটিতে ধ্বসে যেতো এবং তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু তাঁকে রসূলদের মত ধৈর্য দেয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন এসে যায় এবং মিথ্যা নবীদের হত্যা ও মুরতাদদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য এবং বিপদাপদ দূর হয়ে যায়, বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে যায় আর খিলাফতের বিষয়টি সুদৃঢ় হয়ে যায়। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় বদলে দেন, তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করেন, সত্যের ওপর এক জগতকে একত্র করে দেন এবং নৈরাজ্যবাদীদের মুখে কালিমা লেপন করেন। নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন আর নিজ বান্দা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে সাহায্য ও সমর্থন করেন, অবাধ্য নেতাদের এবং মূর্তিগুলোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেন আর কাফেরদের হৃদয়ে এমন ত্রাসের সঞ্চার করেন যে, তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশেষে তারা প্রত্যাবর্তন করে তওবা করে আর এটিই কাহ্হার খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং তিনিই সর্বাধিক সত্যবাদী। অতএব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ! খিলাফতের প্রতিশ্রুতি নিজের সমস্ত অনুষঙ্গ ও লক্ষণাদিসহ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সত্তায় কীভাবে পূর্ণ হয়েছে!

হযরত খালেদ (রা.) সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (রা.) ইয়ামামার অভিযান শেষ করে সেখানেই অবস্থান করছিলেন, এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাকে লিখেন, ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সহায়ক সৈন্য চেয়ে পাঠান। তখন তিনি (রা.) খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)কে এমর্মে পত্র লিখে নির্দেশ প্রদান করেন, ইয়ামামা থেকে যাত্রা করে যত দ্রুত সম্ভব আলার নিকট চলে যাও এবং তাকে সাহায্য কর। ফলে তিনি (রা.) তাদের সাহায্যার্থে সেখানে পৌঁছে যান, হুতমকে হত্যা করেন আর এরপর তাদের সাথে যুক্ত হয়ে 'খুত' অবরোধ করেন। 'খুত'ও বাহরাইনে আব্দে কায়েসের একটি মহল্লা যেখানে অনেক বেশি খেজুর হয়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার নির্দেশ দিলে তিনি (রা.) বাহারাইন থেকে সেই দিকে যাত্রা করেন।

মুজাআ বিন মুরারার মেয়ের সাথে হযরত খালেদ (রা.)-এর বিয়ে সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে সে সম্পর্কে জীবনচরিত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে লিখা রয়েছে, ইমামার যুদ্ধ শেষে বনু হানিফার অবশিষ্ট জীবিত লোকদের সাথে সন্ধির পর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর একটি বিয়ে হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে এই বিয়ের সংবাদ পাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু হযরত খালেদ (রা.) যখন পত্র মারফত বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমস্ত অসন্তুষ্টি দূর হয়ে যায়। বিবরণ অনুসারে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর হযরত খালেদ (রা.) মুজাআর কাছে তার মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। মালেক বিন নুয়ায়রার স্ত্রী লায়লা উম্মে তামীমের ঘটনা এবং এই বিয়ের ফলে হযরত খালেদ (রা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কেও মুজাআ অবগত ছিল। কাজেই সে বলে, আপনি বিরত হোন। অন্যথায় আপনি আমার কোমর ভেঙে ফেলার কারণ হবেন আর আপনি নিজেও হযরত আবু বকর (রা.)-এর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাবেন না। কিন্তু হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তুমি আমার কাছে তোমার মেয়ে বিয়ে দাও। অতএব সে তার কন্যাকে তাঁর কাছে বিয়ে দেয়।

হযরত আবু বকর (রা.) ইয়ামামার সংবাদের জন্য সর্বদা অপেক্ষমান থাকতেন আর তিনি (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর বার্তাবাহকের অপেক্ষায় থাকতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি (রা.) মুহাজের ও আনসারদের একটি দলের সাথে একটি স্থানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত খালেদ (রা.)-এর দূত হযরত আবু খায়সামা (রা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তাকে দেখার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, খবর কী? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে রসূলের খলীফা! সংবাদ ভাল। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইয়ামামায় বিজয় দান করেছেন আর হযরত খালেদ (রা.)-এর এই পত্রটি গ্রহণ করুন। হযরত আবু বকর (রা.) তৎক্ষনাৎ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনমূলক সিজদা করেন এবং বলেন, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে অবগত কর, কীভাবে এটি সম্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বেও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, হযরত আবু খায়সামা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে হযরত খালেদ (রা.) কী করেছেন তা বর্ণনা করেন। কীভাবে সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন, কোন্ কোন্ সাহাবী শহীদ হয়েছেন এবং কীভাবে আমাদেরকে শত্রুদের মুখোমুখি হতে হয়েছে । আরো বলেন যে তারা আমাদেরকে এমন জিনিসে অভ্যস্ত করেছে যেটা আমরা ভালোভাবে জানতাম না।

এরপর হযরত খালেদ (রা.)-এর বিয়ের কথাও আসে। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে পত্র লিখেন, হে উম্মে খালেদের পুত্র! তুমি নারীদের সাথে বিয়ের আনন্দে মত্ত হয়েছ অথচ এখনো তোমার উঠানে এক হাজার দুইশত মুসলমানের রক্ত শুকায় নি। অপরদিকে মুজাআ তোমাকে ধোঁকা দিয়ে সন্ধি করে ফেলেছে অথচ আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে তাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। মুজাআর সাথে সন্ধি আর তার মেয়ের সাথে বিবাহের কারণে রসূলের খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই অসন্তুষ্টির কথা হযরত খালেদ (রা.)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি (রা.) উত্তরে পত্র লিখে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। সেই পত্রে তার অবস্থান স্পষ্ট করেন আর আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি (রা.) লিখেন। তিনি লিখেন, আম্মা বা'দ, ধর্মের শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে করি নি যতক্ষণ আনন্দ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি এবং পরিস্থিতি নিশ্চিৎ হয় নি। আমি এমন ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করেছি যে, মদিনা থেকেও যদি আমি প্রস্তাব পাঠাতাম সে প্রত্যাখ্যান করত না। আমাকে ক্ষমা করবেন! আমি নিজ অবস্থান থেকে প্রস্তাব দেয়াকে প্রাধান্য দিয়েছি। আপনার কাছে যদি এ বিয়ে ধর্মীয় কিংবা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপছন্দনীয় হয় তাহলে আমি আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রস্তুত আছি। বাকি থাকল নিহত মুসলমানদের শোক পালনের বিষয়টি। এ সম্পর্কে বক্তব্য হল কারো শোক প্রকাশ যদি কোন জীবিতকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত অথবা কোন মৃতকে ফেরত আনতে পারত তাহলে আমার শোক প্রকাশও জীবিতকে বাঁচিয়ে রাখত আর মৃতকে ফেরত আনত। আমি এভাবে আক্রমণ করেছি যে, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেছি এবং মৃত্যু নিশ্চিত জ্ঞান করেছি। মুজাআর ধোঁকা দেয়ার যতটুকু সম্পর্ক আছে সেক্ষেত্রে আমি আমার সিদ্ধান্তে ভুল করি নি। কিন্তু আমাকে অদৃশ্যের জ্ঞান দেয়া হয় নি। আল্লাহ্ যা করেছেন মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য করেছেন। তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী করেছেন আর উত্তম পরিণাম তো কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। এ পত্রটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে পৌঁছালে তাঁর রাগ প্রসমিত হয়ে যায়। এছাড়া কুরাইশদের একটি দল এবং যেব্যক্তি হযরত খালেদ (রা.)-এর পত্র নিয়ে এসেছিল সেও হযরত খালেদ (রা.)-এর নির্দোষ হওয়ার কথা বলে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা সত্য বলছ; আর তিনি হযরত খালেদ (রা.)-এর ব্যাখ্যা ও ক্ষমার আবেদন গ্রহণ করেন।

মুরতাদ সংক্রান্ত ঘটনা এখানেই সমাপ্ত হল। অবশিষ্ট ঘটনা ভবিষ্যতে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

[কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত]